أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

(Book# 90) www.motaher21.net

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖ

" সৎকাজ ও তাক্বওয়ার ব্যাপারে তোমরা পরস্পরকে সহযোগিতা কর। "

"Help one another in righteousness."

সুরা: আল-মায়িদাহ

আয়াত নং :-২

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَآئِرَ اللّٰهِ وَ لَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَ لَا الْهَدْیَ وَ لَا الْقَلَآئِدَ وَ لَاۤ آٰمِّیْنَ الْبَیْتَ الْحَرَامَ یَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَ رِضْوَانًا ؕ وَ اِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ؕ وَ لَا یَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا ۘ وَ تَعَاوَنُوْا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْوٰی ۪ وَ لَا تَعَاوَنُوْا عَلَی الْاِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ ۪ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِیْدُ الْعِقَابِ

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর আনুগত্য ও ভক্তির নিদর্শনগুলোর অমর্যাদা করো না। হারাম মাসগুলোর কোনটিকে হালাল করে নিয়ো না। কুরবানীর পশুগুলোর ওপর হস্তক্ষেপ করো না। যেসব পশুর গলায় আল্লাহর জন্য উৎসর্গীত হবার আলামত স্বরূপ পট্টি বাঁধা থাকে তাদের ওপরও হস্তক্ষেপ করো না। আর যারা নিজেদের রবের অনুগ্রহ ও তাঁর সন্তুষ্টির সন্ধানে সম্মানিত গৃহের (কাবা) দিকে যাচ্ছে তাদেরকেও উত্যক্ত করো না। হ্যাঁ, ইহরামের অবস্থা শেষ হয়ে গেলে অবশ্যি তোমরা শিকার করতে পারো। আর দেখো, একটি দল তোমাদের জন্য মসজিদুল হারামের পথ বন্ধ করে দিয়েছে, এ জন্য তোমাদের ক্রোধ যেন তোমাদেরকে এতখানি উত্তেজিত না করে যে, তাদের বিরুদ্ধে তোমরা অবৈধ বাড়াবাড়ি করতে শুরু কর।নেকী ও আল্লাহভীতির সমস্ত কাজে সবার সাথে সহযোগিতা করো এবং গুনাহ ও সীমালংঘনের কাজে কাউকে সহযোগিতা করো না। আল্লাহকে ভয় করো। তাঁর শাস্তি বড়ই কঠোর।

২ নং আয়াতের তাফসীর:

নামকরণ ও অবতীর্ণের সময়কাল:

الْمَائِدَةُ (আল মায়িদাহ) শব্দের অর্থ: দস্তরখানা, খাদ্য ইত্যাদি। অত্র সূরার ১১৪ নং আয়াতে আল মায়িদাহ (الْمَائِدَةُ) শব্দটি থেকে সূরার নামকরণ করা হয়েছে। তাছাড়া এ সূরাতে খাদ্য হিসেবে কোন্ প্রাণী ও বস্তু খাওয়া হালাল বা হারাম সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

সূরা আল-মায়িদাহ সম্পূর্ণ মদীনায় অবতীর্ণ হয়। মদীনায় অবতীর্ণ হওয়া সূরাসমূহের মধ্যে এটি শেষ দিকের সূরা। এমনকি কেউ কেউ এটাকে কুরআনের সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরা বলেও আখ্যায়িত করেছেন। (আল মাবাহিস ফী উলুমুল কুরআন, মান্নাউল কাত্তান পৃঃ ৬৬)।

শানে নুযূল ও ফযীলত:

আবদুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাহনের ওপর আরোহী অবস্থায় সূরা মায়িদাহ অবতীর্ণ হয়। তখন বাহন তাঁকে বহন করতে অক্ষম হলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাহন হতে নেমে পড়লেন। (মুসনাদ আহমাদ হা: ৬৬৪৩, সনদ হাসান, ইবনে কাসীর ৩/৫)

যুবাইর বিন নুফাইর (রাঃ) বলেন: একদা আমি হজ্জ আদায়ের জন্য গমন করি। অতঃপর আমি আয়িশাহ (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাত করার জন্য তার কাছে প্রবেশ করি। তখন আয়িশাহ (রাঃ) বললেন: হে যুবাইর! তুমি কি সূরা মায়িদাহ তেলাওয়াত কর? উত্তরে বললাম: হ্যাঁ। তখন বললেন: এটা সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরা। সুতরাং এতে যা কিছু হালাল হিসেবে পাও তা হালাল হিসেবে গ্রহণ কর আর যা হারাম হিসেবে পাও তা হারাম হিসেবেই গ্রহণ কর। (হাকিম: ২/৩১১, ইমাম হাকিম বলেন: এ হাদীসটি বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুপাতে কিন্তু তারা নিয়ে আসেননি)

রুহুল মা'আনী গ্রন্থকার- আতিয়্যা বিন কায়েস থেকে এর সমর্থনে একটি বর্ণনা নিয়ে এসেছেন:

المائدة من آخر القرآن نزولا فأحلوا حلالها وحرموا حرامها

সূরা আল-মায়িদাহ কুরআনের সর্বশেষ অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এর হালালগুলোকে হালাল হিসেবে ও হারামগুলোকে হারাম হিসেবে গ্রহণ করে নাও। (আহকামূল কুরআন ৪/১৬১)

সূরা আল-মায়িদাহ সূরা নিসার মত বিধি-বিধান সম্বলিত একটি গুরুত্বপূর্ণ সূরা। এ কারণেই রুহুল মা‘আনীর গ্রন্থকার বলেন: বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে যেমন সূরা আল-বাক্বারাহ ও সূরা আলি-ইমরান এক ও অভিন্ন তেমনি সূরা নিসা ও সূরা মায়িদাহ বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে এক ও অভিন্ন; কেননা এ দু’টি সূরায় প্রধানত বিভিন্ন বিধি-বিধান বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে এবং মৌলিক বিধান প্রসঙ্গক্রমে বর্ণিত হয়েছে।

এ সূরায় যে সকল জীব-জন্তু খাওয়া হালাল ও যেগুলো হারাম, শত্রু“ হলেও তার প্রতি ন্যায় বিচার করা, ভাল কাজে সহযোগিতা করা ও অন্যায় কাজে সহযোগিতা না করা, ওযূ ও তায়াম্মুমের পদ্ধতি, বানী ইসরাঈলের প্রতি আল্লাহ তা‘আলার অনুগ্রহ, ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের আল্লাহ তা‘আলার প্রিয়পাত্র হওয়ার দাবী, চোরের বিধান, ইসলামদ্রোহীদের বিধান, কুরআন ও সুন্নাহ ছাড়া অন্য বিধান দ্বারা বিচার-ফায়সালা করার হুকুম, দীনের কোন বিধান নিয়ে ঠাট্টা না করে বরং তার প্রতি আনুগত্য করা এবং যারা ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী তাদের বিধানসহ আরো অনেক মাসআলাহ বর্ণনা করা হয়েছে।

অর্থাৎ হে মুমিনগন, আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অবমাননা করো না। এখানে (شَعَائِر) শব্দটি - (شَعِيْرَةٌ) শব্দের বহুবচন। এর অর্থ, চিহ্ন। যেসব অনুভূত ও প্রত্যক্ষ ক্রিয়াকর্মকে সাধারণের পরিভাষায় মুসলিম হওয়ার চিহ্নরূপে গণ্য করা হয়, সেগুলোকে (شَعَائِرُ الاسْلام) তথা ‘ইসলামের নিদর্শনাবলী’ বলা হয়। যেমন, সালাত, আযান, হজ, দাড়ী ইত্যাদি। অনুরূপভাবে সাফা, মারওয়া, হাদঈ ও কুরবানীর জন্তু ইত্যাদিও আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভুক্ত। [আত-তাফসীরুস সহীহ] আয়াতে উল্লেখিত ‘আল্লাহর নিদর্শনাবলী’র ব্যাখ্যা বিভিন্ন ভাবে বর্ণিত আছে। সব উক্তির নির্যাস হলো এই যে, আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অর্থ সব শরীআত এবং ধর্মের নির্ধারিত ফরয, ওয়াজিব ও এদের সীমা। [ফাতহুল কাদীর]

আলোচ্য আয়াতের সারমর্ম এই যে, আল্লাহর নিদর্শনাবলীর অবমাননা করো না। আল্লাহর নিদর্শনাবলীর এক অবমাননা হচ্ছে, প্রথমতঃ এসব বিধি-বিধানকে উপেক্ষা করে চলা। দ্বিতীয়তঃ এসব বিধি-বিধানকে অসম্পূর্ণভাবে পালন করা এবং তৃতীয়তঃ নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করে সম্মুখে অগ্রসর হওয়া। আয়াতে এ তিন প্রকার অবমাননাকেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। [সা’দী] আল্লাহ তা’আলা এ নির্দেশটিই অন্যস্থানে এভাবে বর্ণনা করেছেনঃ “যে ব্যক্তি আল্লাহর নিদর্শনাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, তা অন্তরের তাকওয়ারই লক্ষণ”। [সূরা আল-হাজ: ৩২] তাছাড়া আয়াতের বাকী অংশে এ নিদর্শণাবলীর কিছু বিবরণ প্রদান করা হয়েছে।

অর্থাৎ পবিত্র মাসসমূহে যুদ্ধ-বিগ্রহ করে এগুলোর অবমাননা করো না। [আততাফসীরুস সহীহ] পবিত্র মাস হচ্ছে জিলকদ, জিলহজ, মুহাররাম ও রজব। এসব মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহ করা শরীআতের আইনে অবৈধ ছিল। অধিকাংশ আলেমের মতে পরবর্তী কালে এ নির্দেশ রহিত হয়ে গেছে। কিন্তু প্রখ্যাত তাবেয়ী ইমাম আতা, শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ এবং ইবনুল কাইয়্যেম মনে করেন যে, এ আদেশ রহিত হয় নি। যদি কেউ

আক্রমণ করে বা যুদ্ধ এর আগে থেকেই চলে আসে তবে এ মাসে যুদ্ধ করা যাবে, নতুবা নয়। [সা'দী, ইবন কাসীর]

এ আয়াতে পরবর্তী নির্দেশ হচ্ছে, কুরবানী করার জন্তু, বিশেষতঃ যেসব জন্তুকে গলায় কুরবানীর চিহ্নস্বরূপ কিছু পরানো হয়েছে, সেগুলোর অবমাননা করো না। এসব জন্তুর অবমাননার এক পন্থা হচ্ছে এদের হারাম পর্যন্ত পৌছতে না দেয়া অথবা ছিনিয়ে নেয়া। দ্বিতীয় পন্থা এই যে, এগুলো কুরবানীর পরিবর্তে অন্য কোন কাজে নিয়োজিত করা। আয়াত এসব পন্থাকেই অবৈধ করে দিয়েছে। আয়াতে আরও বলা হয়েছে যে, তোমরা ঐসব লোকেরও অবমাননা করো না, যারা হজের জন্যে পবিত্র মসজিদের উদ্দেশ্যে গৃহত্যাগ করেছে। এ সফরে তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বীয় পালনকর্তার রহমত, দয়া ও সন্তুষ্টি অর্জন করা। অর্থাৎ পথিমধ্যে তাদের গতিরোধ করো না এবং তাদের কোনরূপ কষ্ট দিয়ো না। [সা'দী]

এখানে ইহরাম অবস্থায় শিকার করতে যে নিষেধ করা হয়েছিল, সে নিষেধাজ্ঞার সীমা বর্ণনা করা হয়েছে যে, যখন তোমরা ইহরাম থেকে মুক্ত হয়ে যাও, তখন শিকার করার নিষেধাজ্ঞা শেষ হয়ে যাবে। অতএব, তখন শিকারও করতে পারবে। [সা'দী]

অর্থাৎ যে সম্প্রদায় হুদায়বিয়ার ঘটনার সময় তোমাদের মক্কায় প্রবেশ করতে এবং ওমরা পালন করতে বাধা প্রদান করেছিল এবং তোমরা তীব্র ক্ষোভ ও দুঃখ নিয়ে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে এসেছিলে, এখন শক্তি-সামর্থ্যের অধিকারী হয়ে তোমরা তাদের কাছ থেকে এভাবে প্রতিশোধ নিও না যে, তোমরা তাদের কাবাগৃহে ও পবিত্র মসজিদে প্রবেশ করতে এবং হজ্ব করতে বাধা দিতে শুরু করবে। এটাই হবে যুলুম। আর ইসলাম যুলুমের উত্তরে যুলুম করতে চায় না। বরং ইসলাম যুলুমের প্রতিদানে ইনসাফ এবং ইনসাফে কায়েম থাকার শিক্ষা দেয়। এটাই প্রমাণ করে যে, ইসলাম হক দ্বীন। [আদওয়াউল বায়ান]

আলোচ্য আয়াতে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার ভিত্তি কি হবে সেটা আলোচনা করা হয়েছে। পবিত্র কুরআন সৎকর্ম ও আল্লাহর ভয়কে আসল মাপকাঠি করেছে, এর ভিত্তিতেই পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার আহবান জানিয়েছে। এর বিপরীতে পাপ ও অত্যাচার উৎপীড়নকে কঠোর অপরাধ গণ্য করেছে এবং এতে সাহায্যসহযোগিতা করতে নিষেধ করেছে। মূলতঃ সৎকর্ম ও তাকওয়াই হলো শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি। কারণ, সমস্ত মানুষ এক পিতা-মাতার সন্তান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়টির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিদায় হজ্জের ভাষণে ঘোষণা করেন যে, 'কোন আরবের অনারবের উপর অথবা কোন শ্বেতাঙ্গের কৃষ্ণাঙ্গের উপর কোন শ্রেষ্ঠত্ব নাই। আল্লাহ ভীতি ও আল্লাহর আনুগত্যই শ্রেষ্ঠত্বের একমাত্র মাপকাঠি।' [মুসনাদে আহমাদঃ ৫/৪১১]

আয়াতে বর্ণিত সৎকাজ ও পাপকাজ এর সংজ্ঞায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'বির বা সৎকাজ হচ্ছে, সচ্চরিত্রতা। আর পাপ হচ্ছে, যা তোমার অন্তরে উদিত হয় অথচ তুমি চাও না যে, মানুষ সেটা জানুক'। [মুসলিম: ২৫৫৩]

অপর হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘বি’র বা সৎকাজ হচ্ছে, যাতে অন্তর শান্ত হয়, চিত্তে প্রশান্তি লাভ হয়। আর পাপ হচ্ছে, যাতে অন্তরে শান্ত হয় না এবং চিত্তেও প্রশান্তি লাভ হয় না, যদিও ফতোয়াপ্রদানকারীরা তোমাকে ফতোয়া দিয়ে থাকুক’। [মুসনাদে আহমাদ ৪/১৯৪]

আর সহযোগিতার ধরণ সম্পর্কেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন, ‘তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য কর, সে অত্যাচারী হোক বা অত্যাচারিত’। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! অত্যাচারিতকে তো আমরা সাহায্য করে থাকি। কিন্তু অত্যাচারীকে কিভাবে সাহায্য করব? রাসূল বললেন, ‘তার দু’হাতে ধরে রাখবে’। [বুখারী: ২৪৪৪]

অপর হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘যে কেউ কোন মুসলিমের সম্মান-ইজ্জত-আব্রু নষ্ট হওয়া প্রতিরোধ করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার মুখমণ্ডল থেকে জাহান্নামের আগুন প্রতিরোধ করবেন। [তিরমিযী: ১৯৩১; মুসনাদে আহমাদ ৬/৪৫০]

তাকওয়া ও বির এর মধ্যে পার্থক্য করে ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, নির্দেশিত বিষয় করার নাম বির, আর নিষেধকৃত বিষয় থেকে বেঁচে থাকার নাম তাকওয়া। [তাবারী]

যে জিনিসটি কোন আকীদা-বিশ্বাস, মতবাদ, চিন্তাধারা, কর্মনীতি বা কোন ব্যবস্থার প্রতিনিধিত্ব করে তাকে তার “শেআ’র” বলা হয়। কারণ সেটি তার আলামত, নিদর্শন বা চিহ্নের কাজ করে। সরকারী পতাকা, সেনাবাহিনী ও পুলিশ প্রভৃতির ইউনিফরম, মুদ্রা, নোট ও ডাকটিকিট সরকারের “শেআ’র” বা নিশানীর অন্তর্ভুক্ত। সরকার নিজের বিভিন্ন বিভাগের কাছে বরং তার অধীনস্থ সকলের কাছে এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের দাবী জানায়। গীর্জা, ফাঁসির মঞ্চ ও ক্রুশ খৃস্টবাদের শেআ’র বা নিশানী। টিকি, পৈতা ও মন্দির ব্রাহ্মণ্যবাদের নিশানী। ঝুঁটি চুল, হাতের বালা ও কৃপাণ ইত্যাদি শিখ ধর্মের নিশানী। হাতুড়ি ও কাস্তে সমাজতন্ত্রের নিশানী। স্বস্তিকা আর্য বংশ-পূজার নিশানী। এ ধর্ম বা মতবাদগুলো তাদের নিজেদের অনুসারীদের কাছে এ নিদর্শনগুলোর প্রতি মর্যাদা প্রদর্শনের দাবী করে। যদি কোন ব্যক্তি কোন ব্যবস্থার নিশানীসমূহের মধ্য থেকে কোন একটি নিশানীর অবমাননা করে, তাহলে এটি মূলত তার ঐ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করার আলামত হিসেবে বিবেচিত হয়। আর ঐ অবমাননাকারী নিজে যদি ঐ ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত হয়, তাহলে তার এ কাজটি তার নিজের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার সমার্থক বলে গণ্য হয়।

“শাআইর” হচ্ছে “শে’আর” শব্দের বহুবচন। “শাআইরুল্লাহ” বলতে এমন সব আলামত বা নিশানী বুঝায় যা শিরক, কুফরী ও নাস্তিক্যবাদের পরিবর্তে নির্ভেজাল আল্লাহ আনুগত্য সূচক মতবাদের প্রতিনিধিত্ব করে। এ ধরনের আলামত ও চিহ্ন যেখানে যে মতবাদ ও ব্যবস্থার মধ্যে পাওয়া যাবে, প্রত্যেক মুসলমানকে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তবে সেখানে শর্ত হচ্ছে তাদের মনস্তাত্বিক পটভূমিতে নির্ভেজাল আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্বের মানসিকতা বিরাজ করা চাই এবং সকল প্রকার মুশরিকী ও কুফরী চিন্তার মিশ্রণ থেকে তাদের মুক্ত হওয়া চাই। কোন ব্যক্তি, সে কোন অমুসলিম হলেও, যদি তার নিজের বিশ্বাস ও কর্মের মধ্যে এক আল্লাহর আরাধনা ও ইবাদাতের কোন অংশ থেকে থাকে তাহলে অন্তত সেই অংশে মুসলমানদের উচিত তার সাথে একাত্ম হওয়া এবং সেই অধ্যায়ে তার যে সমস্ত “শ’আর” নির্ভেজাল আল্লাহর ইবাদাত উপসনার আলামত হিসেবে বিবেচিত হবে সেগুলোর প্রতিও পূর্ণ মর্যাদা প্রদর্শন করা। এ বিষয়ে তার ও আমাদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই বরং সামঞ্জস্য ও সাদৃশ্য আছে সে আল্লাহর বন্দেগী করে কেন, এটা বিরোধের বিষয় নয়। বরং বিরোধের বিষয় হচ্ছে এই যে, আল্লাহর বন্দেগীর সাথে সে অন্য কিছুর বন্দেগীর মিশ্রণ ঘটাচ্ছে কেন?

মনে রাখতে হবে, আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের এ নির্দেশ এমন এক সময় দেয়া হয়েছিল যখন আরবে মুসলমান ও মুশরিকদের মধ্যে যুদ্ধ চলছিল। মক্কা ছিল মুশরিকদের দখলে। আরবের প্রত্যক এলাকা থেকে মুশরিক গোত্রের লোকেরা হজ্ঞ ও যিয়ারতের উদ্দেশ্যে কাবাগৃহের দিকে আসতো। এ জন্য অনেক গোত্রকে মুসলমানদের এলাকা অতিক্রম করতে হতো। তখন মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, তারা মুশরিক হলেও তোমাদের এবং তাদের মধ্যে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করলেও তারা যখন আল্লাহর ঘরের দিকে যাচ্ছে তখন তাদেরকে বাধা দিয়ো না। হজ্বের মাসগুলোয় তাদের ওপর আক্রমণ করো না এবং আল্লাহর সমীপে নজরানা পেশ করার জন্য যে পশুগুলো তারা নিয়ে যাচ্ছে সেগুলোর ওপর হস্তক্ষেপ করো না। কারণ তাদের বিকৃত ধর্মে আল্লাহর আরাধনার যতটুকু অংশ বাকি রয়ে গেছে তা অবশ্যি সম্মান লাভের যোগ্য, অসম্মান লাভের নয়।

আল্লাহর নিশাণীসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের সাধারণ নির্দেশ দেবার পর কয়েকটি নিশানীর নাম উল্লেখ করে তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কারণ তৎকালীন যুদ্ধাবস্থার দরুন মুসলমানদের হাতে ঐগুলোর অবমাননা হবার আশংকা দেখা দিয়েছিল। এ কয়েকটি নিশানীর নাম উল্লেখ করার অর্থ এ নয় যে, কেবল এ ক’টিই মর্যাদা যোগ্য।

ইহ্‌রামও আল্লাহর একটি অন্যতম নিশানী। এ ব্যাপারে যে বিধিনিষেধগুলো আরোপিত হয়েছে তার মধ্যে থেকে কোন একটি ভঙ্গ করার অর্থই হচ্ছে ইহ্‌রামের অবমাননা করা। তাই আল্লাহর নিশানী প্রসঙ্গে একথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, যতক্ষণ তোমরা ইহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায় থাকো ততক্ষণ শিকার করা আল্লাহর ইবাদাতের নিশানীগুলোর মধ্য থেকে কোন একটি নিশানীর অবমাননা বুঝাবে। তবে শরীয়াতের বিধি অনুযায়ী ইহ্‌রামের সীমা খতম হয়ে গেলে তোমাদের শিকার করার অনুমতি আছে।

যেহেতু কাফেররা সে সময় মুসলমানদেরকে কাবা ঘরের যিয়ারতের বাধা দিয়েছিল এবং আরবের প্রাচীন রীতির বিরুদ্ধাচরণ করে মুসলমানদেরকে হজ্জ থেকেও বঞ্চিত করেছিল, তাই মুসলমানদের মনে এ চিন্তার উদয় হলো যে, যেসব কাফের গোত্রকে কাবা যাবার জন্য মুসলিম অধ্যুষিত এলাকার কাছ দিয়ে যেতে হয়, তাদের হজ্জযাত্রার পথ তারা বন্ধ করে দেবে এবং হজ্জের মওসুমে তাদের কাফেলার ওপর অতর্কিতে আক্রমণ চালাবে। কিন্তু এ আয়াত নাযিল করে আল্লাহ তাদেরকে এ সংকল্প থেকে বিরত রাখলেন।

অত্র সূরার প্রথমেই আল্লাহ তা‘আলা মু’মিনদেরকে সম্বোধন করে অঙ্গীকার পূর্ণ করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। عقود শব্দটি عقد এর বহুবচন। অর্থ হল عهد বা চুক্তি, অঙ্গীকার, ইত্যাদি।

ইমাম জাসসাস (রহঃ) বলেন: দু’জন ব্যক্তি যদি ভবিষ্যতে কোন কাজ করা অথবা না করার ওপর একমত হয় তবে তাকেই عهد , عقد ও معاهدة বলে। আমরা যাকে চুক্তি বলি।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন: আল্লাহ তা‘আলা কুরআনে যা কিছু হালাল, হারাম, ফরয ও সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন সবই এ অঙ্গীকারের অন্তভুর্ক্ত। অতএব তা ভঙ্গ ও খেলাফ কর না। অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা কঠিনভাবে হুশিয়ার করে বলেন:

(وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْۭ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَآ أَمَرَ اللّٰهُ بِهٖٓ أَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِي الْأَرْضِ ج أُولٰٓئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْٓءُ الدَّارِ)

“যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হবার পর সেটা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুণœ রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায় তাদের জন্য লা‘নত এবং তাদের জন্য আছে মন্দ আবাস।”(সূরা রা‘দ ১৩:২৫)

যহহাক (রহঃ)

(أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ)

‘তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ কর’এর ব্যাখ্যায় বলেন: আল্লাহ তা‘আলা যেসব বিষয় বৈধ ও অবৈধ করেছেন এবং তার কিতাব ও নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর বিশ্বাস সংক্রান্ত আবশ্যকীয় যে

কাজগুলো করার ওয়াদা নিয়েছেন عقود দ্বারা সেগুলো বুঝানো হয়েছে। এছাড়াও এ সম্পর্কে অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। (ইবনে কাসীর, ৩/৯)

আল্লাহ তা‘আলা ও বান্দার মাঝে যে অঙ্গীকার- বান্দা একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার ইবাদত করবে, তাঁর সকল হক আদায় করবে; রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর উম্মাতের মাঝে যে অঙ্গীকার- উম্মাতেরা রাসূলের আনুগত্য করবে; সন্তান তার পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের পরস্পরের মাঝে যে অঙ্গীকার- তারা পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে এবং তাদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখবে। এছাড়াও মানুষ তার অন্যান্য সঙ্গী সাথীদের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যসহ জীবনের বৈষয়িক বিষয়ে যত অঙ্গীকার করে সব এতে শামিল। (তাফসীর সা‘দী, অত্র আয়াতের তাফসীর)

এ কারণেই ইমাম রাগেব (রহঃ) বলেন: যত প্রকার চুক্তি রয়েছে, সবই এর অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর তিনি বলেন: প্রধানত চুক্তি তিন প্রকার: (১) আল্লাহ তা‘আলার সাথে মানুষের অঙ্গীকার, যেমন ঈমান ও ইবাদতের অঙ্গীকার অথবা হালাল-হারাম মেনে চলার অঙ্গীকার। (২) নিজের সাথে মানুষের অঙ্গীকার। (৩) মানুষের সাথে মানুষের সম্পাদিত চুক্তি, বিবাহ, ব্যবসায়, লেন-দেন ইত্যাদি।

(بَهِيْمَةُ الْأَنْعَامِ)

‘চতুষ্পদ জন্তু’ নর ও মাদী মিলে চতুষ্পদ জন্তু আট প্রকার। সূরা আন‘আমের ১৪৩ ও ১৪৪ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলো হলো: গরু, উট, ছাগল, মেষ এদের নর ও মাদী। এ ছাড়াও আরো অনেক প্রাণী রয়েছে যা খাওয়া হালাল। এক্ষেত্রে সূত্র হল: কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ যা হারাম করেছে তা হারাম, বাকি সব হালাল। কতক সাহাবী এ আয়াত দ্বারা মাদী পশু জবাই করার পর গর্ভে ভ্রূণ পাওয়া গেলে তা হালাল বলেছেন। এ সম্পর্কে সাহাবী আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমরা বললাম; হে আল্লাহর রাসূল! আমরা উটনী ও গাভী অথবা ছাগল জবাই করি আর তাদের পেটে ভ্রূণ পাই, আমরা কি ফেলে দেব, না খাব? তিনি বললেন: তোমাদের ইচ্ছা হলে খাও; কেননা তার মাকে জবাই করাই হল তাকে জবাই করা। (আবূ দাঊদ হা: ২৮২৭, তিরমিযী হা: ৩১৯৯, সহীহ)

(إِلَّا مَا يُتْلٰي عَلَيْكُمْ)

‘যা তোমাদের নিকট বর্ণিত হয়েছে তা ব্যতীত’ অর্থাৎ যা তেলাওয়াত করে শুনানো হবে তা ব্যতীত সব হালাল। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন: অর্থাৎ মৃত প্রাণী, রক্ত, শূকরের গোশত। কাতাদাহ বলেন: রক্ত ও যে পশু যবাই করার সময় আল্লাহ তা‘আলার নাম নেয়া হয় না। এ অংশটুকুর তাফসীর ৩ নং আয়াতে উল্লেখ করা হবে ইনশা-আল্লাহ।

(غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ)

‘তবে ইহরাম অবস্থায় শিকার করা অবৈধ’অর্থাৎ হজ্জের ইহরাম অবস্থায় এসব প্রাণী শিকার করা বা হত্যা করা হারাম। তবে ইহরাম অবস্থাতেও যেসব প্রাণী হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা ব্যতীত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: পাঁচটি প্রাণী মুহরিম ব্যক্তি হত্যা করলে কোন অপরাধ হবে না। কাক, চিল, ইঁদুর, বিচ্ছু ও কালো কুকুর। (সহীহ বুখারী হা: ৩৩১৫)

(إِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ)

‘নিশ্চয়ই আল্লাহ যা ইচ্ছা হুকুম করেন।’অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা যে কোন বিধান দেয়ার ক্ষমতা রাখেন। তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন, তাঁর ইচ্ছার কোন প্রতিরোধকারী নেই এবং কারো কাছে তাঁর জবাবদিহিও করতে হয় না। তবে তাঁর সকল আদেশ-নিষেধ সত্য ও ন্যায়সঙ্গত এবং সৃষ্টির জন্য কল্যাণকর ও উপকারী।

(شَعَائِرَ اللّٰهِ) ‘আল্লাহর নিদর্শন’ শব্দটি شعيرة এর বহুবচন। অর্থ হল চিহ্ন, নিদর্শন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন: এখানে আল্লাহ তা‘আলার নিদর্শন বলতে হাজ্জের নিদর্শনাবলীকে বুঝানো হয়েছে। মুজাহিদ বলেন: এর দ্বারা সাফা ও মারওয়াকে বুঝানো হয়েছে।

মোটকথা হল, এর দ্বারা আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে নিষিদ্ধ ও সম্মানীত সকল বস্তু শামিল যা আল্লাহ তা‘আলা পালন করার ও সম্মান করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং লংঘন করতে নিষেধ করেছেন। (তাফসীরে সা‘দী, অত্র আয়াতের তাফসীর)

الشَّهْرَ الْحَرَامَ

‘হারাম মাস’অর্থাৎ হারাম মাসের সম্মান নষ্ট করতে নিষেধ করা হয়েছে। অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

(يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ ط قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ)

“তারা আপনাকে নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে প্রশ্ন করে; আপনি বলুন, তাতে যুদ্ধ করা বড় অপরাধ।”(সূরা বাকারাহ ২:২১৭)

হারাম মাসসমূহ হল: যুলকাদা, যুলহাজ্জ, মুহাররম ও রজব। (সহীহ বুখারী হা: ৩১৯৭)

(وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ)

‘কুরবানীর জন্য কা‘বায় প্রেরিত পশু, গলায় পরিহিত চিহ্নবিশিষ্ট পশু’হাদী ঐ পশুকে বলা হয়, যা কুরবানী দেয়ার জন্য হাজীগণ সঙ্গে করে হারামে নিয়ে আসেন।

قلائد শব্দটি قلادة এর বহুবচন। যার অর্থ গলায় ঝুলানো হয় এমন হার, মালা ও সুতা। এখানে হজ্জ ও উমরায় কুরবানীর জন্য নিয়ে আসা পশুকে বুঝানো হয়েছে, যাদের গলায় আলামত বা চিহ্ন স্বরূপ জুতা বা ফিতা বেধে দেয়া হয়। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, ঐ সমস্ত পশুকে কেউ যেন ছিনতাই না করে এবং মাসজিদুল হারাম পর্যন্ত পৌঁছার ব্যাপারে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে।

এসব হাদী ও চিহ্নিত পশুকে হালাল মনে করে তার ওপর আক্রমণ বা হস্তক্ষেপ করো না; বরং তাদের সম্মান রক্ষা করবে, এসব নিদর্শনকে সম্মান দেখানো তাক্বওয়ার পরিচায়ক।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

(ذٰلِكَ وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَي الْقُلُوْبِ)

“এটা আল্লাহর বিধান এবং কেউ আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে সম্মান করলে নিশ্চয়ই এটা তার হৃদয়ের তাক্বওয়ার পরিচয়।” (সূরা হজ্জ ২২:৩২)

(وَلَآ أٰمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ ....وَرِضْوَانًاث)

‘নিজ প্রতিপালকের অনুগ্রহ ও সন্তোষ লাভের আশায় পবিত্র গৃহ অভিমুখে যাত্রী’ অর্থাৎ যারা হজ্জ করার জন্য কাবা ঘরের উদ্দেশ্যে রওনা করেছে তাদের সাথে যুদ্ধ করা বৈধ মনে কর না, যাদের উদ্দেশ্য আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টি অর্জন করা এবং জীবনোপকরণ স্বরূপ তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করা।

কোন কোন মুফাসসিরের নিকট এ বিধান ঐ সময়ের জন্য ছিল, যখন মুসলিম ও মুশরিকগণ একত্রে হজ্জ ও উমরা আদায় করত। কিন্তু যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হল:

(أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ إِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا)

“হে মু’মিনগণ! নিশ্চয়ই মুশরিকরা অপবিত্র; সুতরাং এ বৎসরের পর তারা যেন মাসজিদুল হারামের নিকট না আসে।”(সূরা তাওবাহ ৯:২৮)

তখন থেকে মুশরিকদের জন্য মাসজিদে হারামে প্রবেশ করা হারাম হয়ে গেল। আবার কেউ বলেছেন: এ আয়াতের বিধান রহিত নয় বরং এ হুকুম মুসলিমদের জন্য প্রযোজ্য। (ফাতহুল কাদীর, ২/২)

(وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا)

‘যখন তোমরা ইহরামমুক্ত হবে তখন শিকার করতে পার।’ অর্থাৎ যখন ইহরাম থেকে হালাল হয়ে যাবে তখন শিকার কর। এখানে (فاصطادوا শিকার কর) ক্রিয়া আদেশসূচক হলেও মূলত আদেশ করা উদ্দেশ্য নয়, বরং শিকার করার অনুমতি বা বৈধতা প্রদান করা যেমন শিকার করা বৈধ ছিল ইহরামের পূর্বে। অর্থাৎ ইহরাম থেকে হালাল হবার পর শিকার করা কোন অপরাধ নয় যেমন ইহরামের পূর্বে শিকার করা অপরাধ ছিল না।

(وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ)

‘কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনই সীমালঙ্ঘনে প্ররোচিত না করে।’অর্থাৎ কোন জাতির সাথে শত্রুতা, ক্রোধ ও তোমাদের ওপর সীমালংঘন ইত্যাদির কারণে তোমরাও তাদের ওপর সীমালংঘন করবে এটা যেন না হয়। যেমন ষষ্ঠ হিজরীতে মক্কার মুশরিকরা তোমাদেরকে উমরা থেকে বারণ করতে মাসজিদে হারামে পৌঁছতে বাধা দিয়েছিল। সুতরাং এখন তোমরা তাদের ওপর জুলুম করবে বা সীমালঙ্ঘন করবে তা যেন না হয়।

(وَتَعَاوَنُوْا عَلَي الْبِرِّ....)

‘সৎকর্ম ও তাক্বওয়ার কাজে তোমরা পরস্পর সহযোগিতা কর’অত্র আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা মু’মিনদেরকে সৎকাজে পরস্পর সহযোগিতা করার ও অসৎ কাজে সহযোগিতা না করার নির্দেশ প্রদান করেছেন।

যে ব্যক্তি সৎ কাজ করে আর যে সহযোগিতা করে উভয় প্রতিদানের দিক দিয়ে সমান। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

مَنْ دَلَّ عَلَي خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ

সৎ কাজে দিকনির্দেশনাদানকারী প্রতিদানের দিক দিয়ে সৎ কাজ সম্পাদনকারীর মত। (আবূ দাঊদ হা: ৫১২৯, তিরমিযী হা: ২৬৭০, হাসান)

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: যে ব্যক্তি মানুষকে সৎ পথে আহ্বান করে আর ঐ সৎ পথ যত ব্যক্তি অনুসরণ করবে, কিয়ামতের দিন পর্যন্ত সে ব্যক্তি তাদের সমান নেকী পাবে। তাতে তাদের নেকীর কোন কমতি হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মানুষকে অসৎ পথে আহ্বান করে আর তার আহ্বানে ঐ অসৎ পথে যত ব্যক্তি চলবে, কিয়ামতের দিন পর্যন্ত সে ব্যক্তি তাদের সমান গুনাহগার হবে। তাতেও তাদের পাপের কোন কমতি হবে না। (সহীহ মুসলিম হা: ৪৬০৯, তিরমিযী হা: ২৬৭৪)

সর্বোপরি আল্লাহ তা‘আলা মানুষকে তাক্বওয়ার নির্দেশ প্রদান করে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, তোমরা যা কিছু করছ সব কিছুর তিনি তরিৎ হিসাব নেবেন। সুতরাং কোনক্রমেই অন্যের প্রতি জুলুম করো না এবং মানুষকে খারাপ কাজে সহযোগিতা করো না।

আয়াত থেকে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. আল্লাহ তা‘আলা ও মানুষের মাঝে পরস্পর অঙ্গীকার ও চুক্তি পূর্ণ করা ওয়াজিব।

২. আল্লাহ তা‘আলা কিছু চতুষ্পদ জন্তু হালাল করে দিয়েছেন, তবে তা আল্লাহ তা‘আলার নামে ও তাঁর উদ্দেশ্যে জবাই করতে হবে।

৩. ইহরাম অবস্থায় শিকার করা হারাম। তবে ইহরামের পরে বৈধ।

৪. আল্লাহ তা‘আলার নিদর্শনাবলীর সম্মান করা ওয়াজিব।

৫. সীমালঙ্ঘন করা হারাম, এমনকি কাফিরদের সাথেও।

৬. সৎ কাজে পরস্পর সহযোগিতা করা ওয়াজিব। আর অসৎ কাজে সহযোগিতা হারাম।

সুরা: আল-মায়িদাহ

আয়াত নং :-১

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ؕ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَ اَنْتُمْ حُرُمٌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ

হে ঈমানদারগণ! বন্ধনগুলো পুরোপুরি মেনে চলো। তোমাদের জন্য চতুষ্পদ গৃহপালিত পশু জাতীয় সব পশুই হালাল করা হয়েছে তবে সামনে যেগুলো সম্পর্কে তোমাদের জানানো হবে সেগুলো ছাড়া। কিন্তু ইহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায় শিকার করা নিজেদের জন্য হালাল করে নিয়ো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ যা ইচ্ছা আদেশ করেন।

সূরা সংক্রান্ত আলোচনাঃ

আয়াত সংখ্যাঃ ১২০

নামকরণঃ এ সূরারই ১১২ ও ১১৬ নং আয়াতদ্বয়ে উল্লেখিত “মায়েদাহ” শব্দ থেকে এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে। মায়েদা শব্দের অর্থঃ খাবারপূর্ণ পাত্র।

সূরা নাযিলের প্রেক্ষাপটঃ সূরা আল-মায়েদাহ সর্বসম্মত মতে মাদানী সূরা। মদীনায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের মধ্যেও এটি শেষ দিকের সূরা। এমনকি, কেউ কেউ একে কুরআন মজীদের সর্বশেষ সূরাও বলেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা ও আসমা বিনতে ইয়াযীদ রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত আছে, সূরা আল-মায়েদাহ যে সময় নাযিল হয়, সে সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে ‘আদ্ববা’ নামীয় উষ্ট্রীর পিঠে সওয়ার ছিলেন। সাধারণতঃ ওহী অবতরণের সময় যেরূপ অসাধারণ ওজন ও বোঝা অনুভূত হতো, তখনও যথারীতি তা অনুভূত হয়েছিল। এমনকি ওজনের চাপে উষ্ট্রী অক্ষম হয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীচে নেমে আসেন। [মুসনাদে আহমাদঃ ৬/৪৫৫]

কোন কোন বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, এটি ছিল বিদায় হজ্জের সফর। বিদায় হজ্জ নবম হিজরীর ঘটনা। এ হজ্জ থেকে ফিরে আসার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রায় আশি দিন জীবিত ছিলেন। আবু হাইয়ান বলেনঃ সূরা মায়েদার কিয়দাংশ হোদায়বিয়ার সফরে, কিয়দাংশ মক্কা বিজয়ের সফরে এবং কিয়দাংশ বিদায় হজ্জের সফরে নাযিল হয়। এতে বোঝা যায় যে, এ সূরাটি সর্বশেষ সূরা না হলেও শেষ পর্যায়ে অবতীর্ণ হয়েছে। [বাহরে মুহীত]

জুবায়ের ইবনে নুফায়ের থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি একবার হজ্জের পর আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে উপস্থিত হলে তিনি বললেনঃ জুবায়ের, তুমি কি সূরা মায়েদাহ পাঠ কর? তিনি আরয করলেন, জী-হ্যাঁ, পাঠ করি। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, এটি কুরআনুল কারীমের সর্বশেষ সূরা। এতে হালাল ও হারামের যেসব বিধি-বিধান বর্ণিত আছে, তা অটল। এগুলো রহিত হওয়ার নয়। কাজেই এগুলোর প্রতি বিশেষ যত্নবান থেকো। [দেখুনঃ মুস্তাদরাকে হাকেমঃ ২/৩১১]

রহমান, রহীম আল্লাহর নামে

আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যখন শুনবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা 'ইয়া আইয়ুহাল্লায়ীনা আমানু' বা 'হে ঈমানদারগণ' বলছে তখন সেটাকে কান লাগিয়ে শুন। কেননা, এর মাধ্যমে কোন কল্যানের নির্দেশ আসবে বা অকল্যাণ থেকে নিষেধ করা হবে। [ইবন কাসীর]

আয়াতে মুমিনগণকে ওয়াদা-অঙ্গীকার পূর্ণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ কারণেই সূরা মায়েদার অপর নাম সূরা 'উকুদ তথা ওয়াদা- অঙ্গীকারের সূরা। চুক্তি-অঙ্গীকার ও লেন-দেনের ক্ষেত্রে এ সূরাটি বিশেষ করে এর প্রথম আয়াতটি সবিশেষ গুরুত্বের অধিকারী। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমর ইবন হায্মকে ঐ আমলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করে প্রেরণ করেন এবং একটি ফরমান লিখে তাঁর হাতে অর্পণ করেন, তখন এ ফরমানের শিরোনামে উল্লেখিত আয়াতটিও লিপিবদ্ধ করে দেন। [দেখুন, নাসায়ী: ৪৮৫৬; আল খাতীবুল বাগদাদী, আল ফাকীহ ওয়াল মুতাফাককিহ হাদীস নং ৩১৮ (হাদীসটির সনদ হাসান); দেখুন, 'আদেল ইউসুফ আল-'আয্যাযীর টিকা এবং ইরউয়াউল গালীল ১ম খণ্ড: পৃষ্ঠা নং ১৫৮-১৬১]

(عُقُوْدٌ) শব্দটি (عقد) শব্দের বহুবচন। এর শাব্দিক অর্থ বাঁধা, আবদ্ধ করা। চুক্তিতে যেহেতু দুই ব্যক্তি অথবা দুই দল আবদ্ধ হয়, এজন্য এটাকেও (عقد) বলা হয়েছে। এভাবে (عُقُوْدٌ) এর অর্থ হয়-(عهود) অর্থাৎ চুক্তি ও অঙ্গীকার। [তাবারী]

বস্তুত: দুই পক্ষ যদি ভবিষ্যতে কোন কাজ করা অথবা না করার বাধ্য-বাধকতায় একমত হয়ে যায়, তবে তাকেই আমরা আমাদের পরিভাষায় চুক্তি বলে অভিহিত করে থাকি। অতএব, উপরোক্ত বাক্যের সারমর্ম এই যে, পারস্পরিক চুক্তি পূর্ণ করাকে জরুরী ও অপরিহার্য মনে কর। [আহকামুল কুরআন লিল জাসসাস]

তবে এ আয়াতে চুক্তি বলে কোন্ ধরনের চুক্তিকে বুঝানো হয়েছে এ ব্যাপারে তফসীরবিদগণের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেনঃ আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের কাছ থেকে ঈমান ও ইবাদত সম্পর্কিত যে সব অঙ্গীকার নিয়েছেন অথবা আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের কাছ থেকে স্বীয় নাযিলকৃত বিধি-বিধান হালাল ও হারাম সম্পর্কিত যেসব অঙ্গীকার নিয়েছেন, আয়াতে সেগুলোকেই বুঝানো হয়েছে। তাফসীরকার যায়দ ইবনে আসলাম বলেনঃ এখানে ঐসব চুক্তিকে বুঝানো হয়েছে, যা মানুষ পরস্পরে একে অন্যের সাথে সম্পাদন করে। যেমন, বিবাহ-শাদী ও ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি ইত্যাদি। মুজাহিদ, রবী, কাতাদা প্রমুখ বলেনঃ এখানে ঐসব শপথ ও অঙ্গীকারকে বুঝানো হয়েছে যা জাহেলিয়াত যুগে একজন অন্যজনের কাছ থেকে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার ক্ষেত্রে সম্পাদন করতো। [বাগভী]

প্রকৃতপক্ষে এ সব উক্তির মধ্যে কোন বিরোধিতা নাই। কারণ, উপরোক্ত সব চুক্তি ও অঙ্গীকারই (عُقُوْدٌ) শব্দের অন্তর্ভুক্ত এবং কুরআন সবগুলোই পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছে। ইমাম আবুল লাইস আস-সামরিকান্দী বলেনঃ চুক্তির যত প্রকার রয়েছে, সবই এ শব্দের অন্তর্ভুক্ত। তিনি আরো বলেনঃ এর প্রাথমিক প্রকার তিনটি।

(এক) পালনকর্তার সাথে মানুষের অঙ্গীকার। উদাহরণতঃ ঈমান ও ইবাদতের অঙ্গীকার অথবা হারাম ও হালাল মেনে চলার অঙ্গীকার।

(দুই) নিজের সাথে মানুষের অঙ্গীকার। যেমন, নিজ যিম্মায় কোন বস্তুর মান্নত মানা অথবা শপথ করে কোন কাজ নিজের উপর জরুরী করে নেওয়া।

(তিন) মানুষের সাথে মানুষের সম্পাদিত চুক্তি। এছাড়া সে সব চুক্তিও এর অন্তর্ভুক্ত, যা দুই ব্যক্তি, দুই দল বা দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পাদিত হয়। বিভিন্ন সরকারের আন্তর্জাতিক চুক্তি অথবা পারস্পরিক সমঝোতা, বিভিন্ন দলের পারস্পরিক অঙ্গীকার এবং দুই ব্যক্তির মধ্যকার সর্বপ্রকার লেন-দেন,বিবাহ, ব্যবসা, শেয়ার, ইজারা ইত্যাদিতে পারস্পরিক সম্মতিক্রমে যে সব বৈধ শর্ত স্থির করা হয়, আলোচ্য আয়াতদৃষ্টে তা মেনে চলা প্রত্যেক পক্ষের অবশ্য কর্তব্য। তবে শরী'আত বিরোধী শর্ত আরোপ করা এবং তা গ্রহণ করা কারও জন্যে বৈধ নয়। [তাফসীর আবুল লাইস আস-সামারকান্দী]

আয়াতে বর্ণিত (انعام) শব্দটি (نعم) -এর বহুবচন। এর অর্থ পালিত পশু। যেমন- উট, গরু, মহিষ, ছাগল ইত্যাদি। সূরা আল-আন'আমে এদের আটটি প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে। এদের সবাইকে (نعم) বলা হয়। এখন আয়াতের অর্থ দাঁড়িয়েছে এই যে, গৃহপালিত পশু আট প্রকার তোমাদের জন্যে হালাল করা হয়েছে। পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, (عقود) শব্দ বলে যাবতীয় চুক্তি-অঙ্গীকার বুঝানো হয়েছে। তন্মধ্যে একটি ছিল ঐ অঙ্গীকার, যা আল্লাহ তা'আলা হালাল ও হারাম মেনে চলার ব্যাপারে বান্দার কাছ থেকে নিয়েছেন। আলোচ্য বাক্যে এই বিশেষ অঙ্গীকারটিই বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্যে উট, ছাগল ,গরু, মহিষ ইত্যাদিকে হালাল করে দিয়েছেন। শরীআতের নিয়ম অনুযায়ী তোমরা এগুলোকে যবেহ করে খেতে পার। [কুরতুবী]

এখানে সব ধরনের জন্তু বুঝানো হয়নি। বরং সুনির্দিষ্ট কিছু জন্তু বোঝানো হয়েছে। তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে (بَهِيْمَةٌ) যেসব জীব-জন্তুকে সাধারণভাবে নিবোধ মনে করা হয়, সেগুলোকে (بَهِيْمَةٌ) বলা হয়। কেননা, মানুষ অভ্যাসগতভাবে তাদের ভাষা বুঝে না। ফলে তাদের বক্তব্য (مُبْهَم) তথা অস্পষ্ট থেকে যায়। এখানে 'বাহীমা' বলে কোন কোন সাহাবীর মতে, জবাইকৃত প্রাণীর উদরে যে বাচ্চা পাওয়া যায় সেটাকে বোঝানো হয়েছে। [তাফসীরে কুরতুবী; সাদী, বাগভী; ফাতহুল কাদীর]

ইহরাম অবস্থায় শিকার করতে নিষেধ করার মাধ্যমে এটাও উদ্দেশ্য হতে পারে যে, পূর্বে বর্ণিত ‘বাহীমাতুল আন’আম’ বলতে সে সমস্ত প্রাণীকেও বোঝাবে, যেগুলোকে সাধারণত শিকার করা হয়। যেমন, হরিণ, বন্য গরু, খরগোশ ইত্যাদি। কারণ, ইহরাম অবস্থায় শিকার করা হারাম হওয়ার অর্থ স্বাভাবিক অবস্থায় হালাল হওয়া। [সা’দী]

আল্লাহ সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী একচ্ছত্র শাসক। তিনি নিজের ইচ্ছেমত যেকোন হুকুম দেয়ার পূর্ণ ইখতিয়ার রাখেন। কাতাদা বলেন, তিনি তাঁর সৃষ্টির ব্যাপারে যা ইচ্ছে বিধান প্রদানের অধিকারী। তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য যা ইচ্ছা তা বর্ণনা করেন, ফরয নির্ধারিত করেন, সীমা ঠিক করে দেন। আনুগত্যের নির্দেশ দেন ও অবাধ্যতা থেকে নিষেধ করেন। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

তাঁর সমস্ত বিধান জ্ঞান, প্রজ্ঞা, যুক্তি, ন্যায়-নীতি ও কল্যাণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হলেও ঈমানদার শুধু এ জন্যই তার আনুগত্য করে না; বরং একমাত্র সর্বশক্তিমান প্রভু আল্লাহর হুকুম বলেই তাঁর আনুগত্য করে। তাই কোন বস্তুর হালাল ও হারাম হবার জন্য আল্লাহর অনুমোদন ও অননুমোদন ছাড়া আর দ্বিতীয় ভিত্তির আদৌ কোন প্রয়োজন নেই। তারপরও সেগুলোতে অনেক হেকমত নিহিত থাকে। যেমন তোমাদেরকে তিনি অঙ্গীকার পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছেন, কারণ, এতে রয়েছে তোমাদের স্বার্থ। আর এর বিপরীত হলে, তোমাদের স্বার্থহানী হবে। তোমাদের জন্য কিছু প্রাণী হালাল করেছেন সম্পূর্ণ দয়ার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে। আবার কিছু প্রাণী থেকে নিষেধ করেছেন ক্ষতিগ্রস্ততা থেকে মুক্ত রাখার জন্য। অনুরূপভাবে তোমাদের জন্য ইহরাম অবস্থায় শিকার করা নিষেধ করেছেন, তার সম্মান রক্ষার্থে। [সা’দী]

অর্থাৎ এ সূরায় তোমাদের প্রতি যে সমস্ত নীতি-নিয়ম ও বিধি-বিধান আরোপ করা হচ্ছে এবং সাধারণভাবে আল্লাহর শরীয়াত যেগুলো তোমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে, সেগুলো মেনে চলো। ভূমিকা স্বরূপ এ ছোট্ট একটি বাক্যের অবতারণা করার পর এবার সে বাঁধনগুলোর বর্ণনা শুরু হচ্ছে যেগুলো মেনে নেবার হুকুম দেয়া হয়েছে।

মূল শব্দ হচ্ছে, “বাহীমাতুল আন’আম”। “আন’আম” শব্দটি বললে আরবী ভাষায় উট, গরু, ছাগল ও ভেড়া বুঝায়। আর “বাহীমা” বলতে প্রত্যেক বিচরণশীল চতুষ্পদ জন্তু বুঝানো হয়। যদি আল্লাহ বলতেন, “আন’আম” তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে, তাহলে এর ফলে কেবলমাত্র আরবীতে যে চারটি জন্তুকে

“আন’আম” বলা হয় সে চারটি জন্তুই হালাল হতো। কিন্তু আল্লাহ বলেছেনঃ গৃহপালিত পশু পর্যায়ের বিচরণশীল চতুষ্পদ প্রাণী তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। এর ফলে নির্দেশটি ব্যাপকতা লাভ করেছে এবং গৃহপালিত গবাদি পশু পর্যায়ের সমস্ত বিচরণশীল চতুষ্পদ প্রাণী এর আওতায় এসে গেছে। অর্থাৎ যাদের শিকারী দাঁত নেই, যারা জান্তব খাদ্যের পরিবর্তে উদ্ভিজ্জ খাদ্য খায় এবং অন্যান্য প্রাণীগত বিশিষ্টের ক্ষেত্রে আরবের ‘আন’আম’-এর সাথে সাদৃশ্য রাখে। এ সঙ্গে এখানে এ ইঙ্গিতও পাওয়া যায় যে, গৃহপালিত চতুষ্পদ পশুর বিপরীত ধর্মী যে সমস্ত পশুর শিকারী দাঁত আছে এবং অন্য প্রাণী শিকার করে খায়, সেসব পশু হালাল নয়। এ ইঙ্গিতটিকে সুস্পষ্ট করে হাদীসে নবী ﷺ পরিষ্কারভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, শিকারী হিংস্র প্রাণী হারাম। অনুরূপভাবে নবী ﷺ এমন সব পাখিকেও হারাম গণ্য করেছেন যাদের শিকারী পাঞ্জা আছে, অন্য প্রাণী শিকার করে খায় বা মৃত খায়। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেছেনঃ

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كُلِّ ذِى نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ و كُلِّ ذِى مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ

“নবী ﷺ শিকারী দাঁত সম্পন্ন প্রত্যেকটি পশু এবং নখরধারী ও শিকারী পাঞ্জা সম্পন্ন প্রত্যেকটি পাখি আহার করতে নিষেধ করেছেন।” এর সমর্থনে অন্যান্য বহু সংখ্যক সাহাবীর হাদীসও বর্ণিত হয়েছে।

কাবাঘর যিয়ারত করার জন্য যে ফকিরী পোশাক পরা হয় তাকে বলা হয় “ইহরাম।” কাবার চারদিকে কয়েক মনযিল দূরত্বে একটি করে সীমানা চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে। কোন যিয়ারতকারীর নিজের সাধারণ পোশাক বদলে ইহরামের পোশাক পরিধান না করে এ সীমানাগুলো পার হয়ে এগিয়ে আসার অনুমতি নেই। এ পোশাকের মধ্যে থাকে কেবল মাত্র একটি সেলাইবিহীন লুংগী ও একটি চাদর। চাদরটি দিয়ে শরীরের ওপরের অংশ ঢাকা হয়। একে ইহরাম বলার কারণ হচ্ছে এই যে, এ পোশাক পরিধান করার সাথে সাথে মানুষের জন্য এমন অনেক কাজ হারাম হয়ে যায় যেগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় তার জন্য হালাল ছিল। যেমন ক্ষৌরকার্য করা, সুগন্ধি ব্যবহার, সবধরনের সাজসজ্জা, সৌন্দর্য চর্চা, যৌনাচার ইত্যাদি। এ অবস্থায় কোন প্রাণী হত্যা করা যাবে না, শিকার করা যাবে না এবং শিকারের খোঁজও দেয়া যাবে না। এগুলোও এ বিধিনিষেধের অন্তর্ভুক্ত।

অর্থাৎ আল্লাহ সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী একচ্ছত্র শাসক। তিনি নিজের ইচ্ছেমতো যে কোন হুকুম দেবার পূর্ণ ইখতিয়ার রাখেন। তাঁর নির্দেশ ও বিধানের ব্যাপারে কোন প্রকার উচ্চবাচ্য করার বা আপত্তি জানানোর কোন অধিকার মানুষের নেই। তাঁর সমস্ত বিধান জ্ঞান, প্রজ্ঞা, যুক্তি, ন্যায়নীতি ও কল্যাণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হলেও ঈমানদার মুসলিম যুক্তিসঙ্গত, ন্যায়ানুগ ও কল্যাণকর বলেই তার আনুগত্য করে না বরং একমাত্র সর্বশক্তিমান প্রভু আল্লাহর হুকুম বলেই তার আনুগত্য করে। যে জিনিসটি তিনি হারাম করে দিয়েছেন তা কেবল তাঁর হারাম করে দেবার কারণেই হারাম হিসেবে গণ্য। আর ঠিক তেমনিভাবে যে জিনিসটি তিনি হালাল করে দিয়েছেন সেটির হালাল হবার পেছনে অন্য কোন কারণ নেই বরং যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ এসব জিনিসের মালিক তিনি নিজের দাসদের জন্য এ জিনিসটি ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছেন বলে এটি হালাল।

তাই কুরআন মজীদ সর্বোচ্চ বলিষ্ঠতা সহকারে এ মূলনীতি প্রতিষ্ঠিত করেছে যে,কোন বস্তুর হালাল ও হারাম হবার জন্য সর্বশক্তিমান প্রভু আল্লাহর অনুমোদন ও অননুমোদন ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন ভিত্তির আদৌ কোন প্রয়োজন নেই। অনুরূপভাবে আল্লাহ যে কাজটিকে বৈধ গণ্য করেছেন সেটি বৈধ এবং যেটিকে অবৈধ গণ্য করেছেন সেটি অবৈধ,এছাড়া মানুষের জন্য কোন কাজের বৈধ ও অবৈধ হবার দ্বিতীয় কোন মানদণ্ড নেই।

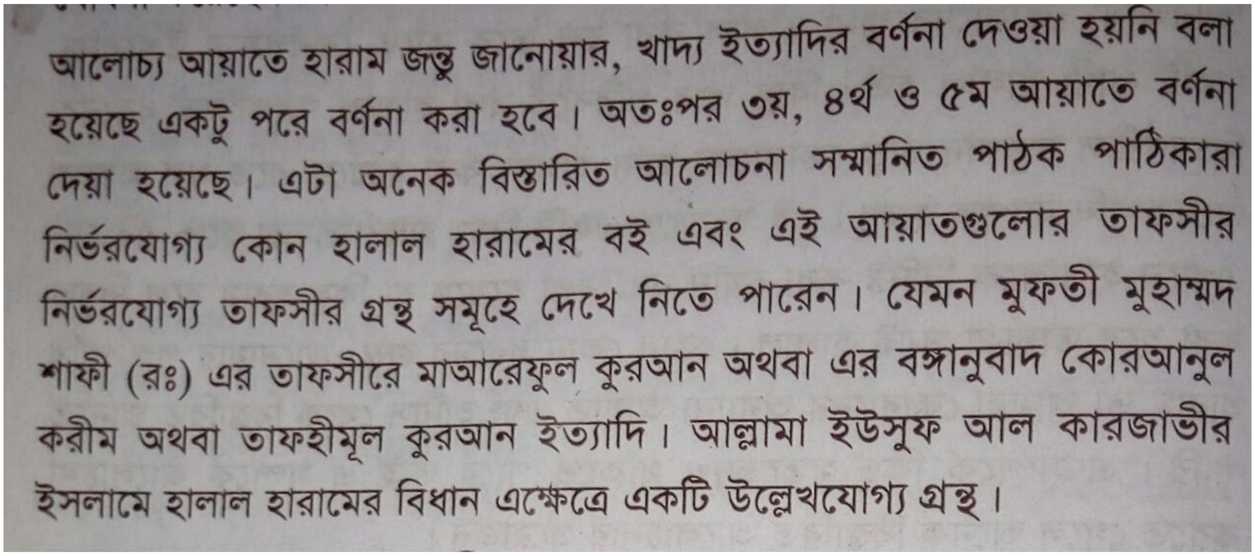

আলোচ্য আয়াতে হারাম জন্তু জানোয়ার, খাদ্য ইত্যাদির বর্ণনা দেওয়া হয়নি বলা হয়েছে একটু পরে বর্ণনা করা হবে। অতঃপর ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম আয়াতে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এটা অনেক বিস্তারিত আলোচনা সম্মানিত পাঠক পাঠিকারা নির্ভরযোগ্য কোন হালাল হারামের বই এবং এই আয়াতগুলোর তাফসীর নির্ভরযোগ্য তাফসীর গ্রন্থ সমূহে দেখে নিতে পারেন। যেমন মুফতী মুহাম্মদ শাফী (রঃ) এর তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন অথবা এর বঙ্গানুবাদ কোরআনুল করীম অথবা তাফহীমূল কুরআন ইত্যাদি। আল্লামা ইউসুফ আল কারজাভীর ইসলামে হালাল হারামের বিধান এক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।